Vol. 6 | No. 1 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্ব পাকস্তানী গদ্য-সাহিত্য

Volume	6
Issue	1
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
Published online	June 15, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i1.6
Pages	185-220
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য-সাহিত্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

[গদ্য-সাহিত্যের এই আলোচনায় কথা-সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সমকালীন গদ্যের ইতিহাসনির্মানেও বর্তমান প্রবন্ধ নিয়োজিত নয়। লেখকদের তালিকা তৈরীর গুরুত্ব যতই হোক না কেন, সে কাজের দায়িত্বও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আসলে এ-রচনা হচ্ছে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ যা-কে বলেছেন how it strikes a contemporary তা-ই। এ আলোচনায় সে-সমস্ত রচনারই উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি ইংরেজী শব্দটিই ব্যবহার করেছি—লেখককে stike করেছে।

বলাবাহুল্য, এ আলোচনা যে নানাদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ হ'বে তা প্রায় নিশ্চয় করেই বলা যায়। লেখকের পীড়াদায়ক ক্ষমতাল্পতা তো আছে-ই। সেই সঙ্গে এও স্মরণীয় যে দৃষ্টির নিরাসক্তি যা-কে বলি তা কাছের মানুষের পক্ষে অনায়াসলভ্য নয়। শুধু অনায়াসলভ্য নয় কেন, ম্যাথু আর্ণল্ড বলবেন, সমকালীনের পক্ষে নিরাসক্ত হওয়া অসম্ভব, এমনকি আদর্শ পরিবেশেও অসম্ভব। ব্যক্তিগত পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে নির্লিপ্ত আলোচনা দূরের মানুষের পক্ষে অধিকতর সহজসাধ্য; কেন না নিকট থেকে দেখা মানে-ই হয় খণ্ডিত করে না হয় অস্বচ্ছ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতগুলি যেহেতু একান্তভাবেই ব্যক্তিগত তাই এতে যে সমস্ত রচনার উল্লেখ করা হয়নি তারা যে খারিজ হয়ে গেল এমন নিশ্চয়ই কেউ মনে করবেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এও হতে পারে যে বর্তমান লেখকের পক্ষে ঐ বিশেষ রচনাটি পড়বার সুযোগই ঘটে নি। এবং ব্যক্ত মতামতগুলির সঙ্গে অনেক পাঠকের মতদ্বৈধ ঘটছে দেখলে এই প্রবন্ধের লেখক বিস্মিত হবেন না, বরং সেটাই স্বাভাবিক মনে করবেন। পরিশেষে, অল্প জায়গায় অনেক রচনার জন্য আসন করতে হয়েছে বলে প্রবন্ধের চেহারায় ঠাসাঠাসি ভিড়ের আদল পড়েছে দেখে লেখক দুঃখিত, সকলের দিকে যথাযথ নজর দেয়া যদি সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যও তিনি শরমিন্দা।]

এক

পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বোধ হয় তার সাহিত্য-সমালোচনা। দু' কারণে এই গুরুত্ব। সমালোচনার সাধারণ গুরুত্ব ত সর্বজন-বিদিত। যে-কোন সাহিত্যের মান-নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খবর তার সমালোচনা-সাহিত্যের কাছ থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সমালোচনার মানের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সৃজনশীল সাহিত্য উৎকর্ষের কোন স্তরে অবস্থান করছে। কিন্তু সমালোচকবুদ্ধি তাই বলে নিষ্ক্রিয়-সত্তা নয়। তার স্বাভাব সঞ্চার-ধর্মী; সৃষ্টিকে সে শুধু প্রভাবিতই করে না, সৃষ্টির চেহারাও সে প্রকারান্তে নির্ধারণ করে দেয়। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার দ্বিতীয় গুরুত্বের কারণ এর সমৃদ্ধি। পরিমাণে গদ্য-সাহিত্যের এই শাখাতেই অধিক সংখ্যক রচনা যুক্ত হয়েছে। তার চেয়েও যা বেশী করে লক্ষণীয় সে হল রচনারীতির দিক থেকে এর উৎকর্ষ। এই দিক থেকে সমকালীন গদ্যের অন্য কোন শাখা হয়ত এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সাহস করবে না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যে-কয়টি প্রচেষ্টা বিগত ১৩ বছরে হয়েছে তাদের কথা-ই প্রথমে উলেখ করতে হয়। উক্ত কাজটি যে কত দুরূহ ইতিহাস-রচনার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই তার সাক্ষ্য কম বেশী বহন করছে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কোন কালেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুরূহতা শুধু তত্ত্বগত নয়, বহুলাংশে তথ্যগতও। অর্থাৎ তথ্যই আমাদের জানা নেই, সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার কথাটিত আসবে আরো পরে। চণ্ডীদাস সমস্যা না হয় আর আমাদের বিব্রত নাই করল, কিন্তু তাই বলে আলাওল বা মীর মোশাররফ হোসেন সমস্যা আমরা এড়াব কি করে? আলাওল বহুল আলোচিত কবি কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কর্ম নিয়ে ততটা বিতর্ক নেই, যতটা বিতর্ক আছে তাঁর জন্মস্থানের প্রসঙ্গে। ডঃ এনামুল হক এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় যে আলাওল চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য গবেষকরা ধারণা করেন আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর। এবং এই বিতর্ক সব সময়ে নিরীহ থাকেনি, কখনো কখনো রুষ্ট বিতণ্ডার চেহারা নিয়েছে। বলতে গেলে মতামতের উত্তেজিত বিনিময়ই বুঝি এই বিতর্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন

বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা বইতে তাঁর যে-অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন তা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়—

'আলাওলের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সাময়িক বাংলা পত্রিকায় যে বীভৎস ও আশোভন সপিণ্ডকরণ চলিয়াছে তাহা বাস্তবিকই পরম লজ্জার বিষয়। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব ডাঃ অবদুল গফুর সিদ্দিকী ও আমাকে যে-অকথ্য গালি-গালাজ করিয়াছেন, তাহা ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।'

শুধু আলাওল নয়, মোহাম্মদ সগীর ও জৈনুদ্দিনকে নিয়েও নাকি অনুরূপ বিতর্ক আছে। তাই ডঃ মযহারুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য পথে বইয়ে উক্ত ঐ দুইজন সাহিত্য সেবীকে 'চাটগাঁ অঞ্চলে' ঠেলে দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। লালন ফকির হিন্দুর সন্তান কি মুসলমানের সন্তান, তাঁর বাড়ী কুষ্টিয়া ছিল কি যশোর ছিল; পাগলা কানাই কোন সময়ের লোক—ইত্যাকার প্রশ্নাদির ও এ ধরণের প্রশ্নগুলিরও কোন স্পষ্ট মীমাংসা হয়নি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাহিত্যসেবীদের নিয়ে যে বিতর্কগুলি আছে তাও কিছু কম বিভ্রান্তিকর নয়। মীর মোশাররফ হোসেন অনেক সাহিত্য সমালোচকের প্রিয় লেখক, সাম্প্রতিক কালে তাঁর সম্পর্কে অনেক কটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কয়টি বই লিখেছিলেন তা এখনো চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয়নি। কেউ বলেছেন ২৫, কেউ বলেছেন ৩৮ এবং অন্যরা ধারণা করেছেন সংখ্যাটি এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি কোথাও হবে। শুধু তাই নয়, মুহম্মদ আবদুল হাই যে বিবি কুলসুমকে আত্মজীবনী হিসাবে বিবেচনা করেছেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সে বইটিকেই উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতান্তরের আসল কারণটি অবশ্য জানা যায় মুনীর চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে ; তিনি লিখেছেন যে আলোচকরা কেউই মীর মোশাররফ হোসেনের বইগুলির 'পাঁচ থেকে সাতখানার বেশী' পড়েননি। সম্ভবতঃ একই কারণে পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী ও মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদকে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান একই লোক বলে মনে করেছেন।

এমন কি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কেও এমন একটি প্রশ্নের উদ্গম-সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যা নিয়ে ভাবীকালের গবেষকরা হয়ত বিতর্কের জালে

জড়িয়ে পড়তে পারেন। আবদুল কাদির লিখেছেন নজরুলের যুদ্ধ গমন করাচীর বাইরে বিস্তৃত হয়নি, (এবং তাঁর এ মতকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করবার কারণ আছে)। কিন্তু বেগম সামসুননাহার মাহমুদ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে নজরুল 'মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে' পর্য্যন্ত গিয়েছেন এবং নঈমুদ্দীনও ধারণা করেছেন যে নজরুল 'যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই পাঠাতেন তাঁর লেখা'।

প্রাথমিক স্তরে এ-ধরনের বিতর্ক না থাকাটাই হয়ত অস্বাভাবিক হত। এই বিতর্কগুলি অন্য যে-সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করছে সেটাই বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সত্যটি হল এই যে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পর্য্যাপ্ত পরিমানে সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি।

কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের যে কয়টি ইতিহাস রচিত হয়েছে তাদের গুণগত উৎকর্ষ উপেক্ষা করবার মত নয়। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাগুলির ভেতর নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস বইটির ভূমিকা পথিকৃতের। লেখকের মতে এ-বই 'শুধু সাহিত্যিকদের জন্ম, মৃত্যু ও রচিত পুস্তকের ইতিবৃত্ত নয়; ইহা নূতন ভাব, ভাষা, সাহিত্য-রুচি ও মুসলমানদের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস।' বইটিতে ব্যক্ত মতামত-গুলির মধ্যে অন্ততঃ দু'টি মত যে নতুন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। এক, বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা, 'বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নয়, আর্য্যভাষাও নয়; ইহা প্রাচীন দ্রাবিড়-(পুণ্ডরীক)দিগের ভাষা।' দুই, "ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সাহিত্য নামধেয় বাংলা গদ্য ছিল না' এই প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদে তাঁর মত 'মুসলিম শাসনকালে যে বাঙ্গালা গদ্যের প্রচলন হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ বর্তমান'।—এই মত দু'টির প্রথমটির সম্পর্কে এমন অভিযোগ করা চলে যে নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি বিস্তারে সক্ষম হয়নি। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মনে হয় সাহিত্যিক গদ্য ও দলিল-দস্তাবেজ-সনদ-ফরমানের গদ্যের ভেতর পার্থক্য আছে বলে তিনি বিবেচনা করেননি। এছাড়া বইটির যে অংশে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আছে সেখানে লেখকের নিজের নামের ইতস্তত উল্লেখ দৃষ্টিকটু। তবু বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস সুখপাঠ্য বই। ভিড়-করা তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ লেখকের সাহিত্যিক মনটিকে আড়াল করে রাখতে পারেনি বলেই মনে হয়।

আব্দুল লতিফ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন ও মধ্যযুগের আলোচনায় সমৃদ্ধ। সাহিত্যের ঐ দুটি 'যুগ' নিয়ে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য বইতে। ডঃ হকের শ্রমনিষ্ঠ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ছাপ বইটিতে বিধৃত আছে। এর দু' একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সত্য কিন্তু সে-বিতর্ক মোটেই অস্বাভাবিক নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এলাকায় লেখকের বিহার একই সঙ্গে সতর্ক ও সচ্ছন্দ। কিন্তু আপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আলোচনায় তাঁর রচনা কিয়ৎ পরিমানে আড়ষ্ট, এমনকি অসতর্কও। লেখকদের নামের বানানে তিনি কিছুটা নতুনত্ব সৃষ্টিতে প্রয়াস পেয়েছেন; সে-প্রয়াস না থাকলেই হয়ত ভাল ছিল। কয়েকটি পরিচিত মুদ্রিত পুথি ও সেগুলির রচয়িতাদের অনুল্লেখ চোখে পড়ে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন যুগ) নাম দিয়ে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধের সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনার যা প্রধান বৈশিষ্ট্য—তথ্যের প্রাচুর্য্য—তা এ বইতেও আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের লেখা। বইটি 'প্রথম খণ্ড' বলে চিহ্নিত, এবং হয়ত কোন বড় পরিকল্পনার এটি প্রথম অংশ। এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল এর ৬১ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি। আর এর প্রধান দুর্বলতা সুপরিকল্পনার অভাব। বইটির অঙ্গসজ্জা ও পেছনের নির্ঘণ্ট (index) যেমন এলোমেলো ভেতরের আলোচনাও তেমনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) একক। ইতিহাসের অন্য বইগুলিতে আধুনিক যুগের কথাও আছে, কিন্তু এ বইতে শুধু আধুনিক যুগের কথাই আছে। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত এই বইটির সাহিত্য-সমালোচনা সক্ষম ও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। আব্দুল হাই লিখিত অংশের বড় গুণ তথ্যের প্রাচুর্য্য, আলী আহসান লিখিত অংশের বিশেষগুণ ভাষার চাতুর্য। বইটি সম্পর্কে সমালোচকরা দুটি অভিযোগ তুলেছেন। এক, দুজন লেখকের রচনা একত্রিত হয়েছে সত্য কিন্তু সমন্বিত হয়নি; দুই, সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় নিয়োজিত কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বইটিতে নেই। অভিযোগ দুটি হয়ত ভিত্তিহীন নয়। সেই সঙ্গে আরো একটি অভিযোগও করা

চলে। আলোচনার দৈর্ঘ্য সর্বথা বিষয়ের গুরুত্ব মেনে চলেনি। মীর মোশাররফ হোসেনের ৪৫ পাতার পাশ রবীন্দ্রনাথের জন্য ১৮ পাতা বরাদ্দ করা শোভন নয়; আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমথ চৌধুরীর চাইতে অধিক আলোচনার দাবী করবেন কেন?—শরৎচন্দ্র ও ইসমাইল হোসেন শিরাজীর অবদান নিশ্চয়ই সামান সমান নয়। কেন এমনটি ঘটেছে তা বোঝা কষ্টকর নয়ঃ মুসলিম লেখকদের উপর বিস্তারিত আলোচনার অভাব পূরণ করাই ছিল বইটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এ কথাও অবশ্যি স্বীকার্য্য যে ঐ আলোচনাগুলিই বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেঃ এ ধরণের বিস্তারিত আলোচনা এর আগে অন্য কোথাও হয়নি; তথাপি, পাশাপাশি অবস্থান করে বলে আয়তনগুলি দৃষ্টিকটু। অনাভাবে পরিকল্পিত হলে হয়ত বইটির সৌষ্ঠব আরো বাড়ত।

বর্তমানের আলোতে অতীতকে নতুন করে যাচাই করা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতনের নতুন মূল্যায়ণ করা সহিত্য-সমালোচকদের একটা বড় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের কিছু কিছু চেষ্টা সমালোচকরা করেছেন। বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যসেবীদের সম্পর্কে কয়েকটি বই সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এ পর্যন্ত চারটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্যালোচনার বই বেরিয়েছে। বই চারটির ভেতর সৈয়দ আলী আহসান রচিত নজরুল ইসলাম একটি। এই বইটিতে কোন উচ্ছ্বাসিত অতিকথন নেই। উল্টে অভিযোগই বরং উঠেছিল, বলা হয়েছিল নজরুলের প্রতিভাকে খাটো করে দেখান হয়েছে এ-বইতে। নজরুলের 'অগ্রপথিক' কবিতাটি যে Whitman-এর Pioneers! O Pioneers! কবিতার ভাষান্তরিত রূপ, অভিযোগকারীদের মতে, এ তথ্যটির অত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন ছিল না। কেন না আধুনিক কবিতাতে বটেই, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও বিদেশী কবিতার ভাষান্তরের দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত নয়; তদুপরি নজরুল নিজেও তাঁর ঋণটি স্বীকার করেছিলেন। সে যাই হোক, বইটির সাহিত্য-সমালোচনা খণ্ডিত হলেও নিরাসক্ত। নজরুল পরিচিতি ও নজরুল সাহিত্য দু'টি প্রবন্ধ সঙ্কলন। প্রথমটির সম্পাদক আব্দুল কাদির, দ্বিতীয়টির মীর আবুল হোসেন। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে নজরুল পরিচিতির রচনাগুলির উদ্দেশ্য নজরুলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা। বইয়ের শুরুতে আব্দুল কাদির যে 'জীবনকথা'টি লিখেছেন তা

প্রামাণ্য বলে দাবী করতে পারে। নজরুলের সঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ ও বেগম সুফিয়া কামালের ব্যক্তিগত পরিচয়ের বর্ণনা গল্পের মত উপভোগ্য। নজরুল সাহিত্য ২৪ জন লেখকের প্রবন্ধ-সঙ্কলন। লেখকদের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন, নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়নে তাঁদের অবলম্বিত পন্থাও ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের বয়সের পার্থক্য আছে, রচনারীতিতেও বিভিন্নতা আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে বইটিতে নজরুল সাহিত্যের যে পরিচয়টি ফুটে উঠেছে তা সকল দিক দিয়েই সমৃদ্ধ। কাজী মোতাহারে হোসেনের নজরুল-কাব্য পরিচিতি তাঁর নিজের মতে 'সমালোচনা নয়, রসগ্রহণমূলক ব্যাখ্যা।' তাই নজরুল কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেননি।

কলেবরের দিক থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের শরৎ প্রতিভা এ-জাতীয় অন্যান্য বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্ফীত। লেখিকা শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করেছেন। এবং চরিত্রকে অতিরিক্ত প্রধান্য দিলে কথাসাহিত্যের বিচারে যে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি স্বাভাবিক তা এ বইকেও স্পর্শ করেছে। শরৎ প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্রের সবগুলি রচনা সম্পর্কে আলাদা আলাদা আলোচনা। এ, কে, এম, আমিনুল ইসলাম জসীমউদ্দিন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন। তাঁর বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য 'ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন'কে 'সামনে রেখে' রচিত বলে, সে-জাতীয় রচনার দোষগুণ দু'য়েই পরিপুষ্ট। সনজীদা খাতুনের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গবেষণানিবন্ধরূপে রচিত। সে কারণে এতে তথ্যের সমারোহ রয়েছে। কিন্তু তথ্যের সমর্থনের উপর ভর করে চলতে হয়েছে বলে তাঁর মতামতগুলি সর্বত্র স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেনি। তথ্যের সমারোহ আব্দুল কাদির রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় গত যুগের কয়েকজন সাহিত্যসেবী সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি তিনি প্রকাশ করেছেন সেগুলি তথ্য-সম্ভারে বিশিষ্ট। মীর মোশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে চারটি পুস্তিকা আলাদা আলাদা বেরিয়েছে। প্রথম পুস্তিকা দু'টির লেখক আব্দুল লতিফ চৌধুরী, পরের দু'টির যথাক্রমে আবু তালিব ও মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী। লোক কবি পাগলা কনাইয়ের উপর ড ঃ মুযহারুল ইসলাম একটি বড় বই লিখেছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে লিখিত প্রবন্ধের যে সঙ্কলনগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। এই ধরনের বইগুলির মধ্যে মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের বই কয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর তিনটি প্রবন্ধ সঙ্কলনের ভেতর ভাষা ও সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ। মতামতের দুঃশাসন উগ্রতা, সংশয়হীন সরল বিশ্বাস, উঁচুগলা অতি-সরলীকরণ প্রভৃতি যে-দুর্বলতাগুলিতে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য সচরাচর ক্লিষ্ট হয় এ বইতে তারা ভিড় করতে পারেনি। আর সমালোচনাধর্মী লেখার পক্ষেও যে পাঠকমনে আনন্দের সঞ্চার অসম্ভব নয় ভাষা ও সাহিত্যে তারও প্রমাণ আছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ালোচনায় লেখকের সাচ্ছন্দ্যবিহার লক্ষণীয়। এতে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৮টি প্রবন্ধ 'ভাষা' পর্যায়ের এবং এই পর্যায়ের লেখাগুলি পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে এই প্রথম। আব্দুল হাইয়ের তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা বইটিতেও 'ভাষার কথা' পর্যায়ের ৭টি রচনা নেহায়েৎ পণ্ডিত্যগ্রাহ্য তত্ত্বের বিবরণ নয়, ভাষা ব্যবহারে আমাদের অভ্যস্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যগুলির সুখপাঠ্য বর্ণনা। আমরা রোজ যা শুনছি, এবং রোজ শুনছি বলেই এ সম্পর্কে সচেতন থাকছি না, ভাষাব্যবহারে সেই দিকগুলি সম্পর্কে তিনি পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন। তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষার বাকি রচনাগুলি পাঁচমিশেলী এবং হয়ত সে-কারণেই গুণগত উৎকর্ষে তারা সমান মানের নয়। এই বিষয়বৈচিত্র্য লেখকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বা ভাষা ও সাহিত্য বইতে নেই; সেদিক থেকে এ বইটি খানিকটা স্বতন্ত্র! আব্দুল হাইয়ের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বক্তব্যকে তিনি সবসময় প্রাঞ্জল করার নীতিতে বিশ্বাসী—হয়ত এ অবিমিশ্র গুণ নয়।

ডঃ মুযহারুল ইসলাম রচিত সাহিত্য পথে সম্পর্কে প্রকাশক দাবী করেছেন যে লেখকের বক্তব্য যেমন 'বলিষ্ঠ তেমনি প্রত্যয় সম্পন্ন'। আমাদের মতে এই দাবী যথার্থ। এবং বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দৃঢ় বলেই হয়ত তাঁর মতামতগুলি কোথাও কোথাও অতিসরলীকরণদুষ্ট। প্রত্যয়ের একটি গুণ তা প্রত্যয়ীকে নিশ্চিতবোধে গরীয়ান করে। আর করে যে তার নজীর আহমদ রফিকের শিল্প, সংস্কৃতি জীবন বইতে পাওয়া যাবে। সমালোচকরা হয়ত একে দুর্বলতা বলবেন, কিন্তু এই

বইয়ের কয়েকটি রচনা প্রশংসনীয়। আলাউদ্দিন আল-আজাদের শিল্পীর সাধনা লেখকের সাংস্কৃতিক নিষ্ঠার পরিচয়বহ।

প্রবীনদের রচনায় এমন একটি অতিরিক্ত dimension থাকা স্বাভাবিক যা বয়স যাদের অল্প তাদের পক্ষে অনলভ্য। অনেক অভিজ্ঞতার যে-দীর্ঘ পথটি তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, অল্পবয়সীদের কাছে যা খবর বা নাম মাত্র তার সঙ্গে তাঁদের যে যোগাযোগ তা দ্বিমাত্রিক আলোচ্য বস্তুতে একটি তৃতীয় মাত্রা যুক্ত করে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের দৃষ্টিকোণ ও আবুল ফজলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধন বই দু'টির কয়েকটি রচনা এই অর্থে ত্রিমাত্রিক। 'পাক বাংলার' সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতামত স্পষ্ট। এবং এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ও প্রশ্নের বিচার করেছেন। 'মুসলিম বাংলায় কাব্য সাধনা' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত প্রবীনদের কাব্যালোচনায় তাঁর দৃষ্টি নির্লিপ্ত; কিন্তু তরুণতর কবিদের সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে অনেক পাঠকই হয়ত একমত হতে নারাজ হবেন। এবং নারাজ যে হবেন তার মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সত্যের ইঙ্গিতও বুঝি আছে। সত্যটি এই যে, শামসুদ্দীন সাহেব যে-যুগের সাহিত্যরুচির প্রতিনিধি, স্বাভাবিকভাবেই সে-যুগের পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে যে ফারাকটি গড়ে উঠেছে তাও নেহায়েৎ কম নয়। আবুল ফজলের বেশ কয়টি প্রবন্ধ স্পষ্টবাদিতার গুণে সমৃদ্ধ। বক্তব্যের পেছনে আন্তরিকতার উষ্ণ পরিচয়টিও উপেক্ষা করবার মত নয়। কিন্তু কোন কোন জায়গায় তাঁর রচনারীতি সাংবাদিকতার সীমা ছুঁয়ে গেছে। এর কারণ দু'টি—অতিরিক্ত বিষয় নির্ভরতা (topicality) ও অতিরিক্ত বাক্‌পটুতা।

আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অঙ্গিকবিচারে লেখকদের অনীহা। সাহিত্যের সমালোচনায় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখাই রেওয়াজ; অঙ্গিকবিচার বাদ দিয়ে সাহিত্যের 'রস' গ্রহণেই আমরা সচরাচর ব্যগ্রতা প্রকাশ করে থাকি। এই স্বভাবের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় নন্দনতত্ত্বের কোন সাধারণ গুণণীয়কের সম্পর্কে আছে কিনা সেও এক প্রশ্ন বটে। সমাজতাত্ত্বিক হয়ত বলবেন, সমাজের শিল্প-অনগ্রসরতার সঙ্গেও এর যোগ আছে। প্রসঙ্গক্রমে এও স্বীকার্য্য যে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা পূর্ব পাকিস্তানী সমালোচনা

সাহিত্যের অপর একটি দুর্বলতা। পরিচিত পরিবেশের বাইরে যেতে অনিচ্ছা—একাধারে এই প্রাদেশিকতার কারণ, লক্ষণ ও ফল; উঁচুগলা উচ্ছ্বাস বুঝি এই প্রাদেশিকতারই প্রমাণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার কথা ও সৈয়দ আলী আশরাফের কাব্যপরিচয় স্বাভাবিকভাবেই ব্যতিক্রম বলে দাবী করতে পারে। দু'টি বইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচ্যের অলঙ্কার শাস্ত্র-নির্দেশিত সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার আঙ্গিক বিশ্লেষণের যে-পদ্ধতি I. A. Richards এর নাম স্মরণ করিয়ে দেয় তার সমন্বয় যে ফলপ্রসূ হতে পারে এই দু'টি সে-সত্যই সপ্রমাণ করে। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত কুশলী মনে হলেও সাধারণভাবে আলী আহসানের রচনারীতি প্রীতিপ্রদ. আলী আশরাফের বিশ্লেষণ-দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের শিল্পরূপ নামে রণেশ দাশগুপ্তের যে বইটি বেরিয়েছে তাতেও প্রাদেশিকতার কোন গ্লানি নেই। কিন্তু লেখকের রচনারীতি সর্বত্র সুঠাম নয়। সমকাল পত্রিকায় অব্দুল কাদিরের ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর ছন্দসচেতনতার পরিচয় বহন করছে।

আমাদের অনেক প্রবন্ধ লেখকেরই মুদ্রিত বই নেই; তাঁদের রচনা সাময়িক পত্রিকাদির পাতায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। যেমন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু মৃত্যুর ছয় বছর পরও তাঁর কোন বই প্রকাশিত হয়নি। ঘটনাটি নিশ্চয়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ—প্রবন্ধের বইয়ের বাজার বা প্রকাশকদের সংখ্যা কোনটাই সন্তোষজনক নয়।

ওয়াজেদ আলী শক্তিমান গদ্যলেখক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক চিন্তাও সাহিত্যরীতি উভয়কে উদ্ভাসিত করে একটি পৌরুষের দীপ্তি ছিল তা তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট করেছে। চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবতঃ empiricism-এ বিশ্বাসী ছিলেন; তাঁর সাহিত্যিক মতামতগুলি নিরালম্ব নির্বিশেষের চাইতে পদচারী বিশেষের প্রতিই অধিকতর পক্ষপাত দেখিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর চিন্তা কোথাও উন্মার্গগামী অবিমূর্ততায় বিহ্বল হয়ে পড়েনি। আর তাঁর রচনারীতির স্থাপত্যধর্মিতা অসতর্ক পাঠককেও আনন্দ দেবার ক্ষমতা রাখত।

মুনীর চৌধুরীরও কোন বই বার হয়নি। তিনি সতর্ক ও সক্ষম সমালোচক। তদুপরি তাঁর রচনা পড়লে তিনি যে সৃজনশীল রচনাতেও

অভ্যস্ত এ সত্যটির মুখোমুখি হওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে তাঁর যে কয়টি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে গুণগত উৎকর্ষে তাদের সব ক'টিই উচ্চমানের। জি, কে, চেষ্টার্টনের সাহিত্যসমালোচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিপক্ষ-মত সামনে দাঁড় করিয়ে সে মতের ভ্রান্তিগুলিকে তুলে ধরা; মুনীর চৌধুরীও সম্ভবতঃ এই সমালোচনা পদ্ধতিতে অস্থাবান। এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবকটি রচনাতেই তিনি এক বা একাধিক দ্বিতীয় মতের উল্লেখ করেছেন যেগুলিকে তিনি সমর্থন করেন না কিন্তু বিশদভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মোশররফ হোসেন', 'জমিদার দর্পণ', 'মীর মানস', 'পাগলা কানাই' বইয়ের সমালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারে পঠিত 'অবিমূর্ত চিন্তার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা' এই সব ক'টি রচনাতেই অন্য পক্ষের প্রস্তাব সামনে রেখে কথা বলার ভঙ্গিটি আছে। এবং এই ভঙ্গির আনুসঙ্গিক নাটকীয় গুণগুলিতে তাঁর রচনারীতি প্রভাবিত হয়েছে।

অজিতকুমার গুহের রচনারীতি দক্ষ, কিন্তু তাঁর রচনার সংখ্যা অল্প। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের রচনাগুলিতে বিষয়বস্তুকে তিনি যে একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়; এই দৃষ্টিকোণটি পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ। আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুল হক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন। মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রচুর লেখেননি, তবে কয়েকটি ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিদের নিয়ে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার ভাষায় যাকে অতি আধুনিক কবিতা বলা হয়, সে বিষয়ে সমকাল-এ প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমানের একটি প্রবন্ধ—'আধুনিক কবিতার লক্ষণ'—বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

পুঁথি সাহিত্যের গবেষক ও সংগ্রাহকদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদের নাম শীর্ষস্থানীয়। এঁদের দুজনে ভেতর পার্থক্য এই যে সাহিত্যবিশারদ 'কলমী' বা অমুদ্রিত পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন, অনুসন্ধানবিশারদ মুদ্রিত পুঁথিকে যাকে অনেকে বলেন 'দোভাষী' বা বটতলার পুঁথি—নিজের এলাকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই

পার্থক্য ছাপিয়েও পাঠকদের চোখে যা বড় করে ধরা পড়েছে তা হল এঁদের দুজনের মতদ্বৈধ ও সাময়িক পত্রিকাদিতে তার প্রকাশ। সে যাই হোক এই দুজন পরলোকগত সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য যে একটা স্থায়ী ঋণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কলমী পুঁথির সংগ্রহে আলী অহমদের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। সুলতান আহমদ ভূঞা প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পুঁথির সম্পাদনার কাজে আহমদ শরীফই সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। লায়লী-মজনু, মধুমালতী, তোহফা, বিস্তারিত টীকাভাষ্য সহ এই তিনটি বড় পুঁথি সম্পদনা করে তিনি রচনাগুলির সঙ্গে আধুনিক পাঠকের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ, মুসানামা, আত্তরা দে বারোজাও তিনি সম্পাদনা করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পুঁথিগুলির একটি বড় পরিচিতি প্রকাশ করার মধ্যেও তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে পাকিস্তান পাবলিকেশন্সও বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য নাম দিয়ে কয়েকটি মুদ্রিত পুঁথির পরিচিতিমূলক আলোচনার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। 'সায়ের ফকীর গরীবুল্লাহ্' ও 'সৈয়দ হামজা' নাম দিয়ে আনিসুজ্জামান সাহিত্য পত্রিকায় যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের বিশেষগুণ এরা বর্ণনামূলক নয়, বিশ্লেষণধর্মী এই বিশ্লেষণধর্মিতা তাঁর অনান্য রচনারও বৈশিষ্ট্য।

পুঁথি সাহিত্য নিয়ে যারা লেখেন তাদের অধিকাংশই সম্পাদক ও সংগ্রাহক, সাহিত্য সমালোচক নন। তাই পুঁথির সম্পাদনা ও তাদের বিবরণ যতটা পাওয়া গেছে, তাদের সাহিত্যিক মূল্যায়ণ চেষ্টার আভাস ততটা দেখা যায় নি। স্বীকার করতেই হবে যে এমন অনেক পুঁথি আছে যাদের সংগ্রহ করার চাইতে বরং বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়, সংরক্ষণযোগ্য পুঁথিরও সকল অংশের সমান দাম হওয়ার কথা নয়। পুঁথিতে শব্দচয়ন ও রূপকল্পের ব্যবহারের রীতিনীতি আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিচার ও বিশ্লেষণের ও প্রয়োজনীয় কাজগুলিও বাকি পড়ে আছে। পুঁথি সাহিত্যের সঙ্গে তৎকালীন সংস্কৃতিসত্তার যোগাযোগগ্রন্থিগুলিকেও সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার প্রয়োজন। উৎসাহী ও সক্ষম সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি যদি এদিকে পড়ে তাহলে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের সম্পদ বাড়বে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগের গ্রন্থিগুলিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হলে যে ইতিহাস-দৃষ্টির প্রয়োজন তা আমাদের দু একজন ঐতিহাসিকের অধিকারে যে আছে তা সত্য। এ প্রসঙ্গে ডাঃ আবু মোহামেদ হাবীবুল্লাহ্‌র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। 'বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান: গুলে বাকাওলী' নামে তাঁর যে-রচনাটি সাহিত্য পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু তার চেয়েও যা বেশী করে আছে তা হল তথ্যের পেছনে সক্রিয় সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির ব্যাখ্যা। তথ্য যে আপাততঃ মাত্র, তার নিজের যে কোন দাম নেই; আইসবার্গের মত উপরের একভাগের চেয়ে নীচের আট ভাগে যা অন্তর্নিহিত আছে তার দামেই যে সে দামী এই সত্যটি এই প্রবন্ধে বিধৃত রয়েছে। একই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য' প্রবন্ধটিও এই ইতিহাস-দৃষ্টির ঘনিষ্ঠ পরিচয়বহ। এই লেখকের রচনারীতি নাগরিক পরিচ্ছন্নতায় বিশিষ্ট। মমতাজুর রহমান তরফদার বাংলা একাডেমী পত্রিকায় যে ৪টি বড় প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের পেছনেও একটি পরিচ্ছন্ন ইতিহাস-দৃষ্টি কাজ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে সাহিত্য সমালোচকদের ভেতর ঐক্যমতের অভাব আছে। নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে পুরাতন ঐতিহ্যের ভূমিকা নিয়ে মত বিরোধ নয়, কেননা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিতে সঞ্চারশীল ঐতিহ্যের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা সকলেই স্বীকার করেন। মতদ্বৈধ সে-ঐতিহ্যের প্রকৃতি নিয়ে। আর মতদ্বৈধের কারণ এই যে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান নতুন হলেও ভাষা হিসাবে বাংলা পুরাণ। তাই প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বলতে আমরা কি বুঝব—সে কি ভাষার ঐতিহ্য, না সংস্কৃতির ঐতিহ্য? আর সংস্কৃতির ঐতিহ্য যদি বুঝি তাহলে সে-সংস্কৃতির চেহারাটা কি?—শিল্পীর সাধনা বইতে আলাউদ্দিন আল আজাদ এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, 'চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার সবই আমাদের ঐতিহ্য।' অপরপক্ষে যাঁরা মনে করেন ভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় নয়, এবং ভাষার চাইতেও যা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তাঁদের বক্তব্য ভিন্ন ধরণের। তাঁদের মতে বাংলা সাহিত্যের সেই অংশই শুধু আমাদের ঐতিহ্য বলে স্বীকৃতি পাবার দাবী করতে পারে যে অংশে পূর্ব-পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিশিষ্ট মূল্যবোধগুলির ঘনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে। সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানী

সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণাও তাঁদের মনে আছে। কিন্তু এই ধারণা আবার সকলের এক ধরণের নয়। অতি উৎসাহীদের ধারণা স্বভাবতঃই সে-ধরণের অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট যা সংস্কৃতিকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যখন প্রবন্ধ লেখেন তখন তার নাম হয় 'মাশরেকী পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠন' বা 'মাশরেকী পাকিস্তানের কালচার'। বলা বাহুল্য সংস্কৃতির চেহারা সম্পর্কে ভিন্নতর অতি সরলীকরণের নজীরও যে নেই তা নয়, এমনতর মতামত আমরা নিশ্চয়ই শুনেছি যে ধর্ম যেহেতু আধ্যাত্মিক বস্তু কাজেই তার পক্ষে জীবনের ব্যবহারিক পরিবেষ্টনে নেমে আসাটা অনধিকার প্রবেশ। আসল সত্যটি, আমাদের মনে হয়, এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি কোথাও খোঁজা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে যে আমরা পুরানো ভূগোল কেটে নতুন ভূগোলের সৃষ্টি করেছি সেটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তাই বলে তার চেহারাকে ভূগোল নিরপেক্ষ অবিমূর্ততায় নিয়ে যাওয়ার নামও অতিসরলীকরণই এবং এ কথাও সম্ভবতঃ সত্য যে ভাষার ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সন্নিহিত—নাকি বলব সংমিশ্রিত—করেই আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের চিত্র রচনা সম্ভব। তা করলে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের চেহারাটা বুঝি মোটামুটি এ রকম দাঁড়ায় —

আমাদের সাহিত্যের উৎস হবে মুসলিম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মীর মোশাররফ হোসেন-নজরুল সমর্থিত বাংলা সাহিত্যের ধারা। যেহেতু এই ধারা বাংলা সাহিত্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ সুতরাং সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই যা কিছু আমাদের আত্মবিকাশের পথকে বিপন্ন করে না এবং যা কিছু আত্মসম্প্রসারণের সহায়ক তাই হবে আমাদের ঐতিহ্য। তবু বিশেষভাবে মুসলিম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উক্ত শিল্প-সার্থক ধারাকে উৎস হিসাবে বেছে নেবার কারণ এই যে পূর্ব পাকিস্তানের গণমানস ও জীবনবৈশিষ্ট্যকে যথার্থরূপে বিবেচনায় রেখে এর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য সৃজনে শরিক হতে হলে এরই সমগোত্রীয় সাহিত্য-স্বরূপকে প্রেরণার উৎস হিসাবে খুঁজে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।'

(—হাসান হাফিজুর রহমান পরিচিতি, প্রথম সংখ্যা)

এই মতটি অধিকতর বিচারসহ ও সমর্থনীয় বলে আমাদের ধারণা। এবং এ পক্ষপাত বলা বাহুল্য, শুধু এই জন্য নয় যে এটি মধ্যপন্থা, বরং এ কারণে

যে ভাষার ঐতিহ্যকে বড় করে দেখতে গিয়ে সংস্কৃতির নিয়ামক শক্তিগুলিকে আমরা যদি উপেক্ষা করি তাহলে সেটা হবে জীবনের কাছাকাছি না আসতে চাওয়ারই নামান্তর। ইংরেজী ভাষাতে পৃথিবীর অনেক দেশের বহুতর লেখক সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে যে বিদেশীদের স্থান লাভ ঘটেছে তাদের সংখ্যা প্রায় নগণ্য। তার কারণ ভাষার কৌশল আয়ত্বে আনা যত সহজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের ভেতর উজ্জীবিত করা তত সহজ নয়। সে কারণেই মধুসূদনের মত শক্তিবান সাহিত্যসেবী অত চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজ হয়ে উঠতে পারেন নি। হেনরী জেমস আমেরিকান সংস্কৃতিকে সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে অনুপযোগী মনে করছেন, য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় প্রবাস-জীবন যাপন করেছেন ইংল্যাণ্ড এসে বসবাস পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর আমেরিকান পরিচয় ঘোচেনি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে ঐতিহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ধারণা মাত্র নয়, সে এমন বস্তু যাকে চিন্তা ও কর্মে, ধ্যান ও ধারণায় উজ্জীবিত করতে হয়। ঐতিহ্যবোধ নিষ্ক্রিয় উত্তরাধিকার নয়, তা সক্রিয় অর্জন করতে হয়, তার বিচ্ছিন্ন ধারাসমূহকে আত্মস্মাৎ করে নিতে হয়। ক্ষোভের কথা, সমকালীন সাহিত্যে ঐতিহ্যের চরিত্র নিয়ে যত বিতর্ক আছে ঐতিহ্যবোধকে আত্মস্মাৎ করার প্রয়াস তত নেই।

পূর্ব পাকিস্তানী সমালোচনা সাহিত্যের এই বিবরণ থেকে যদি মনে হয় যে সে সাহিত্যের ব্যাপ্তি বা উৎকর্ষ কোনটাই সন্তোষজনক নয়, তা হলে যে প্রতিকূলতাগুলির বিরুদ্ধে, বলতে গেলে, সংগ্রাম করে এ সাহিত্য বিকশিত হয়েছে তাদের কথা স্মরণ করা বোধ করি বাঞ্ছনীয়। সকলেই জানেন সমালোচকবৃত্তির অনুশীলনে আমাদের যে অভ্যাস তা নিতান্তই হালের। আমাদের পূর্বসূরীরা সাহিত্য পাঠে যে মুগ্ধ বা গোস্বা হতে জানতেন এ খবর তাঁদের সময়কার সাময়িক পত্রিকা বা পুস্তিকাদি পড়লে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা যে সমালোচনায় অভ্যস্ত ছিলেন—সে সমালোচনা করায় হোক কি পড়ায় হোক—এ খবর তালাস করে বার করতে হয়। এখনো আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যক সাময়িক পত্রিকা নেই যাদের মাধ্যমে আমাদের সমালোচক বৃত্তিগুলি পরিশীলিত হতে পারে। সমালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সত্যিকারভাবে আমরা বিশ্বাস করি এমনও মনে করবার কারণ ঘটেনি। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পরমতসহিষ্ণু এমন কথা বলা কঠিন। সেই সঙ্গে, 'সমালোচকরাও সমাজিক জীব। ব্যক্তিগত

পরিচয়ের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভাষা ও প্রতাপ যে কোন বিচারককে প্রভাবান্বিত করতে পারে' (এশান, জানুয়ারী প্রথম পক্ষ, ১৯৬১)—মুনীর চৌধুরীর এই উক্তি যেমন সত্য, তেমনি যথার্থ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের এই ধারণা যে, আমাদের সমাজে সাহিত্য-সমালোচনার পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির অস্তিত্ব খোঁজাটাই রেওয়াজ। (Contemporary Writer in East Pakistan : Report on First Seminar) তদুপরি স্বীকার না করে উপায় নেই যে আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি যথেষ্ট শিক্ষিত নয়। সচেতন পরিশীলনের চাইতে অশিক্ষিত পটুতাতেই যেন আমাদের ঈমান বেশী। 'স্বাভাব কবি' কথাটা এমনি যতই কৌতুককর শোনাক না কেন আমাদের অধিকাংশ সৃজনশীল সাহিত্যসেবী প্রকারান্তে স্বয়ংসিদ্ধ সাহিত্যস্বভাবকে মূলধন হিসাবে যথেষ্ট বিবেচনা করেন। আর সৃষ্টিতে যাঁরা ব্যর্থপ্রয়াস সমালোচনা যে তাঁদেরই হাতের পাঁচ এ মতও ব্যাপকভাবে গৃহীত ও আদৃত।—প্রতিবন্ধকতা হিসাবে এগুলি নিশ্চয়ই সামান্য নয়। এবং আমাদের সমালোচনা সাহিত্যকে যে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি ডিঙ্গিয়ে এগুতে হয়েছে একথা মনে না রাখলে তার প্রতি অবিচার করার সুযোগ ঘটবে।

দুই

দার্শনিক বা অবিমূর্ত চিন্তায় পূর্ব পাকিস্তানের গদ্য সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়—এমন কথা বললে নিশ্চয়ই বেপরোয়া মন্তব্য করা হবে না। ভাবনার চাইতে ভাবালুতার প্রতিই নাকি আমাদের পক্ষপাতে বেশী। এবং দার্শনিক ভাবনা ও ভাষা—এ দু'য়ের সংযোগ স্থাপনে আমাদের অভ্যাস নিয়ে গর্ব করবারও হয়ত তেমন কারণ নেই।

সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গালোচনায় আমরা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছি. সে মূল্যবোধগুলির প্রকৃতি নির্ণয় ও তাদের পুনর্গঠন চেষ্টায় নিয়োজিত কিছু সংখ্যক রচনা বিবেচ্য সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাগুলিতে সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় নি যতটা দেয়া হয়েছে বৈশিষ্ট্যের উপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাংস্কৃতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে নাজমুল করিম কিছু সংখ্যক

প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৪৯ সালে তমদ্দুন মজলিস নামক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একমাত্র পথ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এর আগে উক্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা বার করেছিলেন। তমদ্দুন মজলিসের অন্যান্য পুস্তিকার মধ্যে আছেঃ শাহেদ আলী লিখিত সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া, আবুল কাসেম লিখিত শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবদুল গফুর সম্পাদিত বিপ্লবী উমর। পুস্তিকাগুলির আয়তনে ছোট এবং সে কারণে তাদের আলোচনার পরিধিও সীমাবদ্ধ। হাসান জামানের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম বিষয় বিচারে এই পুস্তিকাগুলির সমধর্মী, কিন্তু আলোচনার পরিধিতে অনেক বেশী বিস্তৃত। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে এ বইয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি ইসলাম ও কমিউনিজম নামে তাঁর অপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য তত্ত্বকে তথ্যের ওপর দাঁড় করান; সে বৈশিষ্ট্য এই বই দুটিতে লক্ষণীয়। রচনারীতির দিক থেকে তাঁর লেখা সচ্ছন্দগতি; তদুপরি ভাষা বিষয়বস্তুর উপযোগী। মোহাম্মদ আজরফ প্রধানতঃ ইসলামের দার্শনিক দিকগুলি সম্পর্কেই লিখেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বহু রচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসের গতি, সত্যের সৈনিক আবুজর ছাড়াও জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম নামে তাঁর একটি বই আছে।

মরহুম এ, এইচ, এম, মোহীয়ুদ্দীন সম্পাদিত এ যুগের চিন্তাধারা বইটিও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির আলোচনায় নিয়োজিত। এতে সঙ্কলিত পাঁচটি প্রবন্ধের ভেতর আবুল হাশিমের 'ইজতিহাদ' ও ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের 'পাকিস্তানের ঐতিহ্য' শীর্ষক রচনা দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শুধু বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের কারণেই নয়, চিন্তার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও। গোলাম মোস্তফার ইসলাম ও কমিউনিজম এবং ইসলাম ও জেহাদ নামক পুস্তিকা দু'টি এক সময়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

উপরোক্ত রচনাগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় চিন্তা ও আধুনিক জ্ঞানকে সমন্বিত করার চেষ্টা। এবং সে-সম্বন্বয়ের চেষ্টায় লেখকরা যে কোথাও সসঙ্কোচ apologetic ভঙ্গির প্রশ্রয় দেননি, এমনও নয়। প্রত্যয়ের দিক থেকে

এ রচনাগুলিতে নিশ্চয়ই সে দার্ঢ্য নেই যা আছে কার্ডিনাল নিউম্যানের *Grammar of Assent*এ, বা সেই দার্শনিক ব্যাপ্তিও নেই যা আছে আল্লামা ইকবালের *Reconstruction of Religious Thought in Islam*। সে দার্ঢ্য বা ব্যাপ্তি প্রত্যাশা করাও অবশ্য সঙ্গত নয়। সমন্বয়ের চেষ্টা থেকেই apology-র জন্ম এমন ব্যাখ্যা হয়ত সম্ভবপর। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা সত্য হওয়া মানে কিন্তু সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তাটা মিথ্যে হয়ে যাওয়া নয়। এবং এ কথাও আমরা নিশ্চয়ই বলব না এমনিতে প্রত্যয়ের কোন প্রাতিস্বিক মূল্য আছে।

কোরআন ও জীবনদর্শন নামে আবদুর রহমানের যে বইটি বাজারে বার হয়েছে প্রত্যয়ের দিক থেকে তার বক্তব্য বেশ দৃঢ়। তা বলে এও সত্য নয় যে লেখক যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে অসচেতন; যুগের দাবী তিনি মেনে নেবেন কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলবেন যে কোরাণের মূলনীতিগুলি যুগের প্রয়োজন মেটাতে খুবই সমর্থ। যাঁদের প্রত্যয় অনড় তাঁদের মধ্যে অবশ্য মোহাম্মদ আকরাম খাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। দৃষ্টির যে সংস্কারমুক্ততার জন্য স্থবিরতাবিলাসী মুসলিম সমাজে তাঁর রচনা এক সময়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল কোরাণের তফছীরে-ও দৃষ্টির সেই সচ্ছতা বিরাজমান। কোরাণের আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করার ভেতরই যে সামাজিক অগ্রগতির পন্থা নিহিত আছে তাঁর এ প্রত্যয় অবিচলিত। তাই তাঁর তফছীর শুধু পণ্ডিতগ্রাহ্য তত্ত্বকথার সমষ্টিই নয়, প্রয়োগমূল্যে তারা মূল্যবান। মরহুম আবদুল্লাহেল কাফীর নিবন্ধাবলীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আমাদের সাহিত্য মহাপুরুষদের জীবনীমূলক বইয়েরও সংখ্যাপ্রাচুর্য্য নেই। এদের ভেতর যে কয়টি আমাদের চোখে পড়েছে তাদের মধ্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র নবী গৃহ সংবাদ একটি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ আমাদের প্রবীনতম লেখকদের একজন। মরহুম মোস্তাফিজুর রহমানের পুস্তিকা জামালুদ্দিন আফগানি-ও সাহিত্যিক গুণবিবর্জিত নয়। আবদুল মওদুদের মুসলিম মনীষাতে ৪৬ জন মুসলিম মনীষি সম্পর্কে আলোচনা আছে। শুধু জীবনী নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা এলাকায় মুসলিম মনীষার অবদান সম্পর্কে ধারণা দেবার একটি ফলশ্রুতি-সার্থক চেষ্টাও লেখক করেছেন।

ইতিহাসের নানা এলাকা নিয়ে বেশ কিছু রচনা আবদুল মওদুদ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখার গতি নিরলস। পাক-ভারত

উপমহাদেশের বিগত ১৯০ বছরের ইতিহাস নিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম নামে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্ লিখিত একটি বই বেরিয়েছে। তুলনায় বইয়ের শেষ দিককার অংশের আলোচনা অধিকতর বিস্তৃত; এতে করে বইটির সামগ্রিকতা হয়তবা কিছুটা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু তবু, একথাও স্বীকার্য যে ঐ শেষ দিককার অংশটিই তুলনায় অধিকতর আবেদন ঘন। সত্যেন সেনের মহাবিদ্রোহের কাহিনী-ও একই পর্য্যায়ের রচনা। শিল্পকলার ইতিকথা নামে এবনে পোলাম সামাদ যে বইটি লিখেছেন সেটিও ইতিহাসের বই বটে, তবে—নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে—ভিন্ন ধরণের ইতিহাসের।

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কাজে অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করা কঠিন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল তার একটি বড় কারণ অনুবাদ-কর্মের ব্যাপকতা। কিন্তু অনুবাদ শুধু যে সাহিত্যকে সম্পদশালী করে তাই নয়, সাংস্কৃতিকেও সে সমৃদ্ধ করে, মানুষের ব্যক্তিত্বের কাছেও নতুন সম্পদ এনে দেয়। তাই যদি আমরা এমন চাই যে আমাদের ঘরে বাইরে বইবে আলোর বন্যা, স্যাতসেতে দেয়া-খাটাল উঠবে শুকিয়ে, তাহলে সংস্কৃতি চিন্তার দরজা-জানালাগুলি আমাদের খুলতেই হবে। অনুবাদ মানে এই দরজা-জানালা খোলা। অন্যের ভাষায় পড়ে আমরা খবর জানতে পারি, **Information** এর গণ্ডী পেরিয়ে সে জানা যদি **knowledge** এর এলাকায় এসে পৌঁছে ত সে বড় পাওয়া, কিন্তু **wisdom** বুঝি তার গতি-সীমার বাইরেই থেকে যায়। জানাকে **wisdom**-এ পরিণত করার প্রথম সর্ত্ত নিজের ভাষার মাধ্যমে জানা, সবটুকু জানা। অনুবাদ মানে তাই শুধু আমদানী করা নয়, আত্মসাৎ করাও। ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে মানুষের ব্যক্তিত্বের যে একটা নব উন্মেষ ঘটেছিল তার লক্ষণ ও প্রমাণ ছিল সেদিনের মানুষের প্রচণ্ড জ্ঞান তৃষ্ণায়। যে দুঃসাহস নিয়ে সেদিনকার মানুষ অজানা সমুদ্রে নিঃশঙ্ক আবিষ্কার যাত্রায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে বোধ করি সে নির্ভয় চিত্ততারই প্রকাশ ঘটেছিল পুরানো বইয়ের নতুন অনুবাদের কাজে সে যে উৎসাহ দেখিয়েছে তাতে। ইংল্যাণ্ডের রেনেসান্সে অনুবাদ কাজের ভূমিকা অবিস্মণীয়। শুধু ইংল্যাণ্ড বলে কেন, য়ুরোপীয় রেনেসান্সের পেছনে সক্রিয় শক্তিগুলিকে ক্লাসিকসের অনুবাদ লব্ধ জ্ঞান যে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে সে সত্য আজ ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে।

কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কিছু সংখ্যক ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশানসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জীবনী, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের অনুবাদ বই আছে।

ছোটদের জন্য যে বইগুলি এঁরা প্রকাশ করেছেন সেগুলির উন্নতমানের। শিশু-পাঠ্য 'মৌলিক বিজ্ঞান' 'শিশু-শিক্ষা' এবং কিশোর পাঠ্য 'সবজান্তা'—এই তিন সিরিজের বই অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকে সঙ্গত কারণেই পাঠকদের আদর পেয়েছে। 'মৌলিক বিজ্ঞান' সিরিজের বইগুলি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক জহুরুল হক, অধ্যাপক শাহ্ ফজলুর রহমান ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল মুতী 'শিশু-শিক্ষা' সিরিজে প্রকাশিত বইয়ের নামগুলি আকর্ষণীয়—যেমন, হতে হবে বীর পালোয়ান, রাজা বাদশা হাজার মানুষ, সাবধানের মার নেই, মজার মজার অঙ্কগুলো, দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়,— বইগুলির প্রথম তিনটি অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে আশরাফউজ্জামান, আহসান হাবীব, ও এ, এফ, এম, আবদুল মান্নান এবং শেষের দুটি আশরাফ সিদ্দিকী। 'সবজান্তা' সিরিজে আহমদ ফজলুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, তরীকুল আলম, আজিজুর রহমান, প্রমুখের অনুবাদ আছে।

বড়দের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। এগুলির মধ্যে এম, এ, জব্বারের বিশ্ব-রহস্যে আইনস্টাইন, ইব্রাহিম খাঁর আরব জাতির ইতিকথা মহীউদ্দীন আহমদের এ্যালেন পো'র গল্প ও সৈয়দ আবদুল মান্নানের বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

পাকিস্তান পাবলিকেশন্স ইসলামে ধর্ম্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন ও পাকিস্তানের সংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নামে দু'টি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন ইকবালের *Reconstruction of Religious Thought in Islam* এর অনুবাদ; কয়েকজন অনুবাদক মিলে অনুবাদ করেছেন। বলাবাহুল্য, কাজটি সহজ ছিল না; তার কারণ দার্শনিক চিন্তা ও দার্শনিক নিবন্ধরচনা দু' কাজেই আমাদের অভিজ্ঞতার সীমা সঙ্কীর্ণ। সে অনভ্যস্থতার ছাপ হয়ত অনুবাদের কোথাও কোথাও পড়ে থাকবে। কিন্তু অনুবাদকের ঐকান্তিকতার প্রশংসা না করে

উপায় নেই। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একটি প্রবন্ধ সঙ্কলনের অনুবাদ। মূল বইটির সম্পাদক এস, এম, ইকরাম। ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক অনুবাদ করেছেন; তাঁদের রচনারীতিতে বিভিন্নতা আছে, হয়ত অনুবাদগুণেরও ইতরবিশেষ চোখে পড়বে, কিন্তু তাতে বইটির সামগ্রিক ঐক্য ব্যাহত হয় নি। এ প্রসঙ্গে এম, এন, রায়ের *The Historical Role of Islam* এর মুহম্মদ আবদুল হাই কৃত অনুবাদ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য।

দু'টি য়ুরোপীয় ক্লাসিক্‌সের অনুবাদ করে নূর মোহাম্মদ মিঞা আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ-শাখার উৎকর্ষকামীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বই দুটি রুশোর **Social Contract** ও ম্যাকিয়াভেলীর **The Prince**। যথাক্রমে 'সমাজ সংস্থা' ও 'শাহজাদা' নাম দিয়ে তিনি এই দুটি বইয়ের অনুবাদ করেছেন।

মার্কিন প্রচার বিভাগের উদ্যোগে কয়েকটি আমেরিকান বইয়ের অনুবাদ মনোরম অঙ্গসজ্জায় শোভিত হয়ে বাজারে বেরিয়েছে। শুধু অঙ্গসজ্জা নয়, কয়েকটি বইয়ের গুণগত বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষা করবার মত নয়।

লক্ষ্য করবার বিষয়—অথবা বলা চলে এ এতই স্পষ্ট যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করলেও চোখে পড়ে—যে অনুবাদ যা হয়েছে তার অধিকাংশই ইংরেজী থেকে। এবং এটা স্বাভাবিকও। ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ, অন্য ভাষার তুলনায় ইংরেজীর চর্চা সমাজে অনেক বেশী। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের কাছে লাটিনের, অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়ানদের কাছে ফরাসী ভাষার যে মর্যাদা ছিল, আমাদের কাছে ইংরেজীর কদর সেই পর্য্যায়েরই।

তবে আরবী এবং উর্দু থেকেও কিছু কিছু বই অনূদিত হয়েছে। আরবী বইগুলির অধিকাংশ-ই ধর্মমূলক। ধর্মমূলক বইয়ের অনুবাদকদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি কয়েকখণ্ড কোরাণের অনুবাদ ও তফছীর প্রকাশ করেছেন। সব কয়টি খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয়নি; কিন্তু যে কয়টি হয়েছে তারা নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ তফছীরের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি সংস্কার মুক্ত, অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষা সমর্থদেহ। আবুল ফজল 'কোরাণের বাণীর' একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন।

আবদুর রহমান খান ও ফজলুল করিম যথাক্রমে কোরাণ ও মিশকাতের অনুবাদ করেছেন। বাংলা একাডেমী তজরীদুল বুখারীর অনুবাদ করিয়েছেন একটি অনুবাদ সংঘকে দিয়ে। এক বিষয়ে এই অনুবাদ কয়টির ভেতর একটা সাদৃশ্য আছে; এদের তেমন প্রসাদ-গুণ নেই যা পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। Authorised Version of the Bible-এর রচয়িতারা অনুবাদের কাজে যে দু'টি মূলনীতি অনুসরণ করেছিলেন এঁরা তা করেননি। মূলনীতি দু'টির একটি ছিল; অক্ষরিক অনুবাদের চাইতে অর্থের ভাষান্তরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং অপরটি; অনুবাদে ইংরেজী বাগবিধি মেনে চলা। মূলনীতি দু'টির উপযোগিতা আনস্বীকার্য্য এবং হয়ত এদের প্রয়োগাল্পতার জন্যই ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সকল শ্রেণীর পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। অথচ সে আবেদন সৃষ্টির প্রয়োজনই ছিল বেশী। পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির অনেক উপাদানই যে ধর্মের অবদান-সম্ভূত এমন ঈমান আমাদের পোক্ত হলেও, সেই উপাদান বা অবদান কোনটারই প্রকৃতি আমরা যথাযোগ্যভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারিনি। মৌলিক রচনার অভাব হয়ত অনুবাদের সাহায্যে মিটতে পারত; অনুবাদের মাধ্যমে হয়ত আমরা আমাদের অনেক আকিদার প্রকৃতি, মূল্যবোধের উৎস ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারতাম। কিন্তু যে অনুবাদগুলির প্রকাশিত হয়েছে তাতে জ্ঞানের সম্ভার যাই থাকনা কেন আনন্দের সমাবেশ অতটা নেই যাতে করে পাঠকরা আকৃষ্ট বোধ করতে পারে। কাজেই, পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজন মেটানোর কাজে এই বইগুলি যে যথাযোগ্য ভূমিকাগ্রহণ করতে পারে নি বা পারবেনা—এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

মওলানা আজাদের কয়েকটি উর্দু বই সম্প্রতি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এদের ভেতর 'তাজা কলমে'র করা অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন ও নূরুদ্দিন আহমদের অনূদিত মৃত্যুর দুয়ারে মানবতার নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের প্রাচুর্য্য নেই। অন্যদিক দিয়ে যতই গরমিল থাক না কেন, এক বিষয়ে ধর্মবেত্তা ও বিজ্ঞানবিদের ভেতর একটা মিল আছেঃ নিজেদের চিন্তা ও জ্ঞান এবং বাংলা ভাষা এই দুয়ের ভেতর সখ্যস্থাপনে তাঁদের উৎসাহ অল্প; ঔদাসীন্য বেশী। অন্ততঃ কিছুদিন আগ পর্য্যন্তও তা-ই ছিল। সুখের কথা, 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' নামে যে সাময়িক

পত্রিকাটি এখন প্রকাশিত হচ্ছে তাতে ঔদাসীন্য ভাঙ্গাবার লক্ষণ কিছু কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ নিশ্চয়ই আনন্দিত হবার মত খবর। আমাদের ভাষা ও বিজ্ঞান-চিন্তার ভেতর যদি আত্মীয়তা স্থাপিত হয় তাহলে তাতে করে শুধু যে ভাষার শব্দসম্পদ ও প্রকাশক্ষমতাই বাড়বে তা নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হবে। আর বিজ্ঞানবুদ্ধির বিস্তৃতি মানেও জীবন-দৃষ্টির বিজ্ঞাননির্ভরতা লাভ।

বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে যে ক'টি বই গত ১০ বছরে বেরিয়েছে তাদের ভেতর শাহ্ ফজলুর রহমানের মহাশূন্যে অভিযান বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বইটি বাঙলা একাডেমীর 'বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রচার গ্রন্থমালা' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত সহজবোধ্য সুখপাঠ্য ভাষায় মহাশূণ্যে মানুষের অভিযানের তথ্যাদি সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করানোই বইটি রচনার উদ্দেশ্য। এবং সে কাজে তিনি সফল হয়েছেন, একথা বলা চলে। ছোটদের জন্য আবদুল্লাহ আল-মুতী যে দু'টি বই লিখেছেন—এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে ও অবাক পৃথিবী—তারাও উন্নত মানের।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সাম্প্রতিক গদ্যের একটি আলোকিত এলাকা। সাহিত্য পত্রিকায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামে একটি সুদীর্ঘ গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে। এই ধারার বৈশিষ্ট্য ভাষা-বিশ্লেষণে 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির' প্রয়োগ। প্রসঙ্গতর উল্লেখযোগ্য যে, যে পাণ্ডিত্য ও শ্রমনিষ্ঠার জন্য তিনি শ্রদ্ধেয় তার পরিচয় ঐ গ্রন্থটি পুরোপুরিই বহন করছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে 'পদ্ধতি' বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যে পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো ঘনিষ্ঠতার সীমায় পৌঁছেনি সেটি হল বর্ণনামূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপ-রেখা নির্ণয়ে নিয়োজিত নয় তার বর্তমান রূপ পর্য্যালোচনাতেই সন্তুষ্টচিত্ত। ভাষার রূপ কি হওয়া উচিৎ তা ঠিক করে দেয়া এর অভীপ্সিত নয়, ভাষা কোন রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এই বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করে মুহম্মদ আবদুল হাই সম্প্রতিককালে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছেন। এক হিসাবে এই রচনাগুলির ভূমিকা পথিকৃতের। সাহিত্য পত্রিকায় বাংলা স্বরধ্বনি, ব্যাঞ্জনধ্বনি, ধ্বনিব্যবহার ধ্বনিগুণ, বাংলা শব্দ ও অক্ষরভাগ, বাংলা ধ্বনি প্রবাহ—প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনাগুলির বিষয়বস্তু পাঠকদের কাছে অপরিচিত ঠেকলেও রচনারীতির

গুণে সহজবোধ্য। অবদুল হাই ব্যবহৃত পরিভাষা সমূহ একই সঙ্গে অর্থবহ ও ব্যাঞ্জনাময়। মুনীর চৌধুরী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *A Study of Nasals & Nasalisation in Bengali* বইটির যে সমালোচনাটি সাহিত্য পত্রিকায় লিখেছেন তা বিষয়ের সঙ্গে অপরিচিত পাঠককেও মুগ্ধ করবে।

তিন

রম্য রচনা, ভ্রমণ কাহিনী ও স্মৃতিকথা জাতীয় রচনার চরিত্র এক ধরনের। এরা গল্প শুনার তৃপ্তি দেয়, কিন্তু এরা গল্প নয়; আবার চিন্তার ফসল যদি বা বহন করে তবু এরা প্রবন্ধ নয়। এধরনের রচনা হয়ত দু'য়ের একটি সন্ধি। সে যাই হোক, কোন সাহিত্যে এ জাতীয় রচনার স্বল্পতা না থাকলে তার দ্বারা সংস্কৃতি সত্তার সমৃদ্ধি সপ্রমাণিত হয়। বোঝা যায় রুচি ক্রমশঃ নগরস্বভাব হচ্ছে আর এমন লোকের সংখ্যাও বাড়ছে যাঁরা অল্পবয়সীদের কাছে যা ইতিহাসস্বরূপ তেমন ঘটনা নিজের চোখে ঘটতে দেখেছেন। পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতি এই বিশেষ অর্থে ক্রমশঃ সহজ হয়ে উঠছে।

প্রথমে ভ্রমণকাহিনীর কথা ধরা যাক। একজন তরুণ লেখক এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে 'কোন দেশ বা বিখ্যাত স্থান আমাদের পক্ষে ভাল করে জানা' সম্ভবপর নয়, তার কারণ 'আমরা আমাদের প্রচলিত সংস্কার আর নীতিবোধের তাড়নায় জীবনকে উপভোগ করতে শিখিনি' (সওগাত, পৌষ ১৩৬৭)। কিন্তু তাঁর এই আশঙ্কাটি পুরোপুরি সত্য নয়; অন্ততঃ ভ্রমণকাহিনীর বর্ধিষ্ণু সংখ্যা সে-কথাই বলবে। ভ্রমণকাহিনী সমকালীন পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্যের একটি স্ফীত অঙ্গ।—যানবাহনের আশ্চর্য উন্নতিতে পৃথিবীটা আজ প্রায় আক্ষরিক অর্থেই আমাদের ঘরের কাছে এসে গেছে, আমাদের বিস্ময়বোধও সে অনুপাতে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তবু দেশভ্রমণের উপভোগ্য অভিজ্ঞতা যে আমাদের অনেক লেখককেই আনন্দিত করেছে ভ্রমণকাহিনীর বইগুলি সেই সত্যটির দিকেই ইঙ্গিত করে।

এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনীগুলিকে সাধারণভাবে তিনভাগে ভাগ করা চলে। এক, বিদেশী মানুষের জীবনযাত্রা, আচার আচরণের বর্ণনামূলক লেখা। সেখানে লেখক সতর্কতার সঙ্গে বিদেশকে দেখেছেন এবং সে দেখার

ফলশ্রুতি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বিলেতে সাড়ে সাত শ' দিন, ইব্রাহিম খাঁর ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, বেগম শামসুননাহার মাহমুদের আমার দেখা তুরস্ক, মোহাম্মদ মোদাব্বেরের জাপান ঘুরে এলাম—নাম থেকেই হয়ত অনুমান করা যায়—এ ধরণের রচনা। দুই, ব্যক্তিমানুষে চরিত্র বর্ণনা, যেখানে লক্ষ্যবস্তু জনতা নয়, বিচ্ছিন্ন মানুষ। ঘটনা সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু ঘটনার চেয়েও যার বেশী গুরুত্ব তা হল মানুষের চরিত্র; ঘটনার আলোকে লেখক মানুষের মুখ চিনে নিতে চেয়েছেন। প্রথম প্রকারের রচনার পক্ষপাত যদি হয় প্রবন্ধের প্রতি, তাহলে এই দ্বিতীয় প্রকারের রচনার টান ছোটগল্পের দিকে। জহুরুল হকের সাত স'াতার, সলিমুল হক খান মিস্কির চেনা অচেনায়, ইবনে ইমামের জলে-স্থলেকে এই পর্যায়ে ফেলা চলে। আর এক ধরণের ভ্রমণকাহিনী আছে যারা এই দুই পর্য্যায়ের মাঝামাঝি পথ ধরে চলতে চেষ্টা করে— ঘটনা ও চরিত্র, জনতা ও বিচ্ছিন্নমুখ সেখানে এক সঙ্গে মিশে আছে। জসীমউদ্দিনের চলে মুসাফির, ইব্রাহিম খাঁ'র নয়া জগতের পথে আ, ন, ম, বজলুর রশীদের পথ বেধে দিল, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের দূরে দূরান্তরে এই জাতীয় রচনা।

বিলেতে সাড়ে সাত শ দিনে মুহম্মদ আবদুল হাই বিদেশকে বিচার করেছেন তুলনামূলক পদ্ধতিতে—অর্থাৎ বিদেশের সঙ্গে সেখানে দেশের কথাও উল্লিখিত হয়েছে বইটি এই বিশেষ পদ্ধতির দোষ-গুণ দুয়েই সমৃদ্ধ। শিরোনাময় বিশদের প্রতি পক্ষপাতের যে-ইশারা আছে বইয়ের সর্ব্বত্র তার পরিচয় বর্তমান—বিদেশকে তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছেন এবং সঙ্গে বিদেশের আলোকে দেশকে নতুন করে দেখে নিতে প্রয়াস পেয়েছেন। তুরস্ক ভ্রমণের উপর ইব্রাহিম খাঁ ও বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের দু'টি বই বেরিয়েছে। বিষয়বস্তু এক ধরণের হলেও বইদুটির একটি অপরটি থেকে আলাদা। ইব্রাহিম খাঁর বর্ণনা ভঙ্গি তুলনায় অধিকতর মজলিসী; তাঁর রচনারীতি অনাড়ম্বর ও অনানুষ্ঠানিক।

জহুরুল হকের সাত স'াতারের স্বাদ অনেকটা ছোট গল্পের। লেখকের বিষয়বস্তু বিদেশের ভূগোল নয়, বিদেশের কয়েকটি মানুষ। তারা অনেক দূর দেশে থাকে, তাদের সমাজ-পরিবেশের কথা যত না মনে পড়ে তার চেয়ে অনেক

বেশী অন্তরঙ্গতা জন্মে মানুষ হিসাবে তাদের পরিচয়ের সঙ্গে। সংবেদনশীলতার সঙ্গে ভাষার সংযমের মিশ্রণ বইটির গুণ বাড়িয়েছে। চেনা অচেনায় সলিমুল হক খান মিশ্কির ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী উপভোগ্য। এখানেও ঘটনা ছাপিয়ে মানুষের পরিচয়ই বড় হয়ে উঠেছে। যে মুখগুলির কথা লেখক বলেছেন তাদের পরিচয় বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও তত্ত্বালোচনা উঁকি-ঝুঁকি দিতে চেয়েছে; এই উঁকি-ঝুঁকি না থাকলে ক্ষতি ছিল না, এমন কি বইয়ের পেছনে লেখক-পরিচিতটুকুও। ইবনে ইমামের জলে-স্থলে বইটিও চরিত্রচিত্রনের জন্য উল্লেখযোগ্য। শানাউল হকের 'বন্দর থেকে বন্দরে' সমকালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের চরিত্রাঙ্কন দক্ষ

আ, ন, ম, বজলুর রশীদের পথ বেঁধে দিল পড়লে লেখক যে কবি এই সত্যটির মুখোমুখি হওয়া যায়। না, শুধু এই জন্য নয় যে বইতে গদ্যের সঙ্গে কবিতাও মুদ্রিত আছে, এই কারণেও যে দেখবার ভঙ্গি ও বর্ণনার রীতি উভয় ক্ষেত্রেই কবি সুলভ উল্লাসের পরিচয় প্রায় নিরবিরাম। জসিমউদ্দিনের ভ্রমণ কাহিনী চলে মুসাফিরে যদি কাব্যিকতা পথ বেঁধে দিল'র চাইতে বেশী থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের কারণ হবে না। বেগবান স্রোতের সঙ্গে যে ভাষা-ব্যবহারের তুলনা করা চলে, সে সম্ভবতঃ এই বইয়ের ভাষার মত। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের দূরে দূরান্তর বইতে কাব্যোচ্ছ্বাস নেই। ইব্রাহিম খাঁর নয়া জগতের পথে সুখপাঠ্য রচনা।

একথা মানতেই হবে ভ্রমণকাহিনীর বইগুলি বেশ জনপ্রিয়। তার কারণ বোঝা কষ্টকর নয়। এদের আবেদন প্রধানতঃ আমাদের কৌতূহলের কাছে। দূরের দেশ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কমেছে সত্য, কিন্তু আদিম কৌতূহলের মৃত্যু নেই। মার্কোপোলো'র মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সমসাময়িক লোকেরা যতই সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন, তার গল্প না শুনে কারো নিস্তার ছিল না। তার কারণ ঐ কৌতূহল। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ঐ কৌতূহলের কারণেও পাঠককে আজো ভ্রমণকাহিনী কান পেতে শুনতে হয়।

ভ্রমণকাহিনীতে লেখক কথা বলেন উত্তমপুরুষে, নিজ জবানীতে। লেখকের অজান্তেই হয়ত সেখানে, অন্য ভাল নামের অভাবে যাকে বলা চলে আত্মম্ভরিতা— তার কিছুটা প্রকাশ ঘটে। চেষ্টা করেও বুঝি 'হ্যাঁ, আমি যা দেখেছি তুমি

তা দেখনি, অতএব মন দিয়ে শোন, জ্ঞান বাড়বে,' এধরনের একটি ভাব এড়ানো সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু পাঠকত তাতে আপত্তি করবেন না, বরং ভেতরে ভেতরে খানিকটা কৃতজ্ঞও বোধ করেন, লেখক তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করছেন দেখে। রম্যরচনা এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধেও লেখকের কথা বলা উত্তম পুরুষে, কিন্তু সে উত্তম পুরুষের ভূমিকা ভিন্ন, সেখানকার 'আমি' যেন গল্পের নায়ক। নিজের কথা বলা অথচ হাম বড়াই না করা—এই দ্বৈতস্বভাবের মিলন এ জাতীয় রচনার একটি বড়গুণ। রম্যরচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাই একান্ত করে নগরস্বভাব: ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, রচির সূক্ষ্মতা, দৈনন্দিন জীবনের অনেক দেখা খুটিনাটি ঘটনার বিশ্লেষণদক্ষতার ভেতর এই নাগরিকতাই বিধৃত।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নুরুল মোমেনের বহুরূপা অনন্য। এই বইয়ের সবগুলি রচনার ভেতর রুচির একট নগরস্বভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। লেখকের ভঙ্গিটি অনায়াস, তাঁর রচনার কোথাও আড়ষ্টতার পরিচয় নেই। ভাষা ব্যবহারের সযত্ন প্রয়াসের ছাপ নেই, বক্তব্য নিজেই নিজগুণে দাঁড়িয়ে আছে। এবং বলাই বাহুল্য তত্ত্বমূল্যে ওজনদার বলে দাবী করবে এমন ইচ্ছে বক্তব্যের মোটেই নেই, কিন্তু তবু তার এমন একটি উদ্ভাস আছে যা প্রতিদিনের ঘটনাকে নতুন করে চিনতে সাহায্য করে। ইবনে ইমামের চিত্র-বিচিত্র যেন রম্যরচনার প্রান্তসীমা নির্দেশ করতে চেয়েছে; কোথাও কোথাও সে-সীমা লঙ্ঘিতও হয়েছে—এই বইয়ের যদি কোন সাবটাইটেল থাকত তাহলে তা হতে পারত 'অবিশ্বাস্য'। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের নাম উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি কথা মরহুম মোতাহের হোসেন চৌধুরীর রচনা। এটি প্রবন্ধের সঙ্কলন; কিন্তু লেখক জ্ঞানাভিমানী নন, গোমরামুখত ননই। একটি প্রসন্ন সংস্কৃতি-চেতনা বইটিকে আর পাঁচটি প্রবন্ধ সঙ্কলন থেকে আলাদা করে রেখেছে। আমাদের গদ্যে গ্রাম্যতার প্রাচুর্য্যের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের রুচির নাগরিকতাটিকে দুর্লভ বলতে হয়। রুচির নাগরিক পরিচ্ছন্নতা রম্যরচনাতেই হয়ত অধিকতর সহজপ্রাপ্য। স্মিত-হাসি-স্নিগ্ধ যে লিখনরীতি সংস্কৃতি কথা'কে বিশিষ্ট করেছে তাও রম্য-রচনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে একথা যেন মনে না করি যে লেখকের বক্তব্য শুধুই হাল্কা, কেবলি ব্যক্তিগত। সংস্কৃতি

সম্পর্কে অন্যের চিন্তার আলো গ্রহণে তিনি কার্পণ্য করেন নি। তাঁর বক্তব্য প্রসার বা গভীরতা কোনটারই ঘাঁটতি নেই। লেখকের মতে সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি দুটি: মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার। এবং এই বইতে সংস্কৃতির বিভিন্ন এলাকায় মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের নির্মল আলো ফেলে নতুন মূল্যবোধ সৃজনের কাজে পড়শি-প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। তাঁর ভূমিকা শিক্ষকের নয় সহযোগীর; ভঙ্গিটি বক্তার নয়, আলাপচারীর। এথেন্সে সভ্যতার যে আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল তার একটি লক্ষণ—ক্লাইভ বেল বলেছেন—স্মিত হাসির ভঙ্গি। লেখক এই স্মিত হাসির পক্ষপাতি; এবং পক্ষপাতি যে একথা তিনি কোথাও গোপন রেখেন নি। সব মিলিয়ে সংস্কৃতি কথা এমন একটি বই যা পাঠকের মনে আনন্দের একটা স্পর্শ রেখে যায়।

স্মৃতিকথা লিখবার মত লোক থাকাটা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সপ্রমান করে।—সাহিত্যিক অর্থেত বটেই, এমন কি সমাজতাত্ত্বিক অর্থেও। ইতিহাসকে ঘটতে দেখেছেন, অথবা ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন প্রচীনরা যদি নবীনদের পাশাপাশি লেখেন তা হলে তার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির ঐতিহ্য-ব্যাপ্তির ইশারাই ফুটে ওঠে। স্মৃতিকথা আরো একটি কাজ করে, অতীত আর বর্তমানের সহ-অবস্থানের ব্যবস্থা করে একের অলোয় অন্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

আমাদের বিবেচ্য সময়ে স্মৃতিকথা যা লেখা হয়েছে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী লেখা হতে পারত। যাঁরা লিখতে পারতেন বা পারেন তাঁরা সকলে লেখেননি। তবু একেবারে যে লেখা হয়নি তা নয়। যেমন, নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের বর্ণনামূলক দুটি পূর্ণাঙ্গ বই বেরিয়েছে; শামসুন নাহার মাহমুদের নজরুলকে যেমন দেখেছি ও মঈনুদ্দীনের যুগ-স্রষ্টা নজরুল। এছাড়াও নজরুল পরিচিতিতে আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও সুফিয়া কামাল স্মৃতিকথামূলক রচনা লিখেছেন। প্রতিভার যে একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ আছে, আশে পাশের মানুষকে যে সে আনন্দিত করতে পারে, এ রচনাগুলি পড়লে সে সত্যটি প্রত্যক্ষ করা যায়। মঈনুদ্দীনের ভাষা উচ্ছাসিত, শামসুননাহার মাহমুদ অপেক্ষাকৃত সংযতবাক। স্মৃতিকথার বইয়ের যুগস্রষ্টা নজরুল—এমন নামকরণও যথার্থ নয়। তবে তথ্য সম্ভারে এই বইটিই অধিকতর বেশী সমৃদ্ধ।

নজরুলের সঙ্গে পরিচয়ের বিবরণ আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনী আমার শিল্পী জীবনের কথা'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এইটেই সম্ভবতঃ বইয়ের আকারে প্রকাশিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী। সাধারণভাবে আত্মজীবনীর একটি সীমাবদ্ধতা এই যে তাতে পরের সাফল্যের আলোকে আগের ঘটনার ব্যখ্যা দিতে হয়; ফলে জীবনটা সরলরেখার ঋজুতা নিয়ে দেখা দেয়—মনে হয় এ যেন পূর্বপরিকল্পিত, যেন অমনভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্যই এর সূচনা। আমার শিল্পীজীবনের কথা—বইয়ের এই শিরোনামা বিপদের ঐ ঝুঁকিটা হয়ত নিয়েও ছিল; কিন্তু আনন্দের কথা বইটি সে বিপদের শিকার হয়নি। তদুপরি, ভাষা-ব্যবহারে লেখকের শিল্পীসুলভ পরিমিতিবোধ ও শিল্পসম্মত প্রসাদগুণ বইটিকে গুণান্বিত করেছে।

আত্মজীবনী পাঠের একটা বড় লাভ পেছনের কালকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পারা। জসীমউদ্দিনের যাঁদের দেখেছি বইতে এই পেরিয়ে আসা কালের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, আকর্ষণীয় রীতিতে। যে যুগে নজরুল ইসলাম মুসলিম সাহিত্য কর্ম্মীদের মধ্যমণি, রবীন্দ্রনাথ জীবিত—বইটিতে সে যুগের সাহিত্যিক পরিস্থিতির একটি নিকট-চিত্র ধরা পড়েছে। জসীমউদ্দীননের গদ্যরীতি এখানে একাধারে সচ্ছন্দ ও আবেগবহ।

ইব্রাহিম খাঁ মোহাম্মদীতে (১৩৬২) ধারাবাহিকভাবে তাঁর স্মৃতিকথা—'বাতায়ন'—লিখেছেন। তাতেও পেছনের কালের অন্তরঙ্গ রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অন্যত্র যেমন লেখকের ভাষারীতি এখানেও তেমনি, মজলিসী, অনানুষ্ঠানিক। এই স্মৃতিকথার দুর্বলতা—বিশদের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত: খুটিনাটির বিবরণ এত আছে যে তাতে সামগ্রিক চিত্র অস্পষ্ট হয়েছে, ইংরেজীতে যাকে বলে গাছের ভিড়ে বনের চেহারা হারিয়ে যাওয়া তা-ই। চৌধুরী শামসুর রহমানের পচিশ বছরে বিশদের অধিক্য নেই, কিন্তু তাই বলে প্রসাদগুণেরও খুব একটা যে প্রাচুর্য্য আছে, এমনও নয়।

চার

পূর্ব পাকিস্তানের এ-পর্য্যন্ত একটি নির্ভরযোগ্য অভিধান সঙ্কলন যে সম্ভব হয়নি, খবর হিসাবে এটি সকলেরই জানা। এই দৈন্য আমাদের শরমিন্দা করুক আর না-ই করুক, এ হয়ত দু'টি সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। এক, অভিধান ছাড়াও আমাদের চলে, অর্থাৎ ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে

আমরা যথেষ্ট সচেতন নই ; দুই, তেমন কোন সাহিত্যিক উৎসাহে আমরা উদ্বুদ্ধ বা প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারিনি যার নিরন্তর তাড়নায় অভিধান সঙ্কলনের মত কঠিন কাজও সোৎসাহে গ্রহণ না করে স্বস্তি মেলে না। ডঃ জনসন একাই একটি অভিধান প্রণয়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, অনাদর অনুৎসাহ তাঁর উদ্দীপনাকে বিচলিত করতে পারেনি। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিষ্ঠার, প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শ্রমশীলতার সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে এমন একটি উৎসাহ ঐ আপাতঃ বিষণ্ণ ব্যক্তিটির ভিতর গড়ে উঠেছিল যা অভিধান সঙ্কলনের দায়িত্ব পালনের আগে তাঁকে রেহাই দেয়নি বলাবাহুল্য, অমনতর কোন উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় এখনো আমরা দেখাতে পারিনি।

উপরে উক্ত ইশারা দু'টিকে যদি সত্য বলে মেনে নি' তাহলে পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের প্রকৃতি ও দুর্বলতার একটা ব্যখ্যা তা থেকে পেতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের অধিকাংশ লেখকই গদ্যের ব্যবহারে সচেতন অভিনিবেশ ও সতর্ক অধ্যবসায় প্রয়োগে উৎসাহী নন ; অথবা ততটা উৎসাহী নন যাতে অভিধানের ব্যবহার অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন। গদ্যের শিল্প-সাফল্যের জন্য বক্তব্যের গুরুত্বকেই আমরা যথেষ্ট মনে করি, তার বাইরের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-আচরণটা যেন নিতান্তই গৌণ। এর ফলে শব্দ নির্বাচন, ভাষা ব্যবহার ও রচনা সৌকর্যের দিকটাতে নজর পড়ে কম। আমাদের ধারণা ভাষা ব্যবহারের কৌশলটা বুঝি কারিগরের হস্তকৌশলের মত ; সেটা বংশানুক্রমে পাওয়া যায় এবং যা পাওয়া যায় তা-ই যথেষ্ট, উত্তরাধিকার হিসাবে লব্ধ কৌশলকে নিজের আয়াসে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা বেগার খাটা বৈ নয়। অশিক্ষিত পটুতা বংশানুক্রমিকভাবে আয়ত্বে আনা সে সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য যে সংস্কৃতি সামন্ততান্ত্রিক ও গ্রাম-নির্ভর। সামন্ততন্ত্র প্রাচীন কৌশল সম্পর্কে অভিযোগ করে না, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও তার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা সচল থাকে। আমাদের সাংস্কৃতিক মেজাজটি এখনো সামন্ততন্ত্রিক, তার চরিত্র এখনো গ্রামনির্ভর ; শিল্পবিপ্লব এখনো দূরের আশা। তা-ই অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে যেমন, গদ্যেও তেমনি, অশিক্ষিত পটুতা ও বংশানুক্রমিক দক্ষতার উপরই আমাদের অধিকাংশ গদ্যলেখক প্রধানতঃ আস্থাবান ও নির্ভরশীল। আমাদের গ্রামস্বভাব সাহিত্যচেতনা তেমন আত্মসন্তুষ্টিতে প্রশান্ত যার কল্যাণে অভাব যদি বা থাকে কিন্তু অভাববোধ থাকে না, যা আছে তাতেই যথেষ্ট মনে করা চলে। এ জন্যই আমাদের গদ্য-

মোটামুটিভাবে যে ছবির ধারণা দেয় সে এমন একটি গ্রাম্যজীবনের যার বাসিন্দারা পিতা-প্রপিতমহের আমলের কৌশল প্রয়োগ করে কৃষিকার্য করে থাকে, নতুন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটাকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করে—হয়ত বা সন্দেহ করে, হয়ত বা ভয়-ও।

অভিধান যে আমরা সঙ্কলিত করতে পারিনি তা আমাদের উৎসাহের অভাব-জনিত মানসিক আলস্যও সপ্রমাণ করে। সামন্ততন্ত্র মানসিক আলস্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। আমাদের মানসিক আলস্য হয়ত সংস্কৃতি সত্তা থেকেই উৎসারিত। তদুপরি এওত' জানা কথা যে সামন্ততন্ত্র অধীনস্থদের যে-গুণটির উপর গুরুত্ব দেয় তার নাম আনুগত্য। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সে পরিপোষক নয়। ব্যক্তি তাই প্রচলিতের বাইরে যেতে ভয় পায়, তার আবর্তন পরিচিত বৃত্তের ভিতর অভ্যস্ত নিয়মানুবর্তিতায় বদ্ধ। এই আলস্য, নতুন পথে পদচারণায় ভয় ও অসামর্থ পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য রচনাতে প্রতিফলিত হয়েছে। রচনারীতির চাইতে বক্তব্যকে আমরা অধিক গুরুত্ব দেই সত্য, কিন্তু বক্তব্য নিজ গ্রামের বাইয়ে যেতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। আমাদের গদ্য যে দার্শনিক বা অবিমূর্ত্ত চিন্তায় সমৃদ্ধ নয়, অনুবদে কর্মে যে আমরা অনুৎসাহী তা ঐ মানসিক আলস্যরই পরিচয়বহ। লেখকের বক্তব্য তাঁর প্রকাশ-মাধ্যমকে chalange করেছে আমাদের গদ্যে এমন দৃশ্যের প্রচুর্য্য নেই। উল্টোটা দেখতেই বরং আমরা অভ্যস্ত—সদাচারী বক্তব্য পূর্বনির্ধারিত অঙ্গিকের সঙ্গে আপোষরফা করে চলেছে। অর্থাৎ সমাজের এলাকায় যেমন ব্যক্তি, গদ্যের form-এর কাছেও তেমনি বক্তব্য—উভয়েরই এক দশা, নির্বিকার মেনে নেয়া, ঘাড় নীচু পথ চলা। বক্তব্যের সেই দুঃশাসন প্রচণ্ডতা নেই যার অত্যন্তিক চাপে form পাল্টে যাবে, নতুন নতুন চেহারা নেবে। অর্থাৎ শুধু কৌশল নয়, ব্যক্তব্যের পুঁজিও পুরান। বক্তব্যে যদি তীব্রতা থাকত তাহলে অঙ্গিক অনগ্রসর হলেও গদ্যের রচনাশরীরে হয়ত সে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ঘটত যে সৌন্দর্য্য আছে প্রাচীন যুগের কবিতায় বা স্থাপত্য শিল্পে। প্রাচীন কবিতার ভারি আঙ্গিক ছাপিয়ে বক্তব্যের যে দ্যোতনা পাঠককে আনন্দ দেয়, শক্ত পাথরের গায়ে কল্পনার যে খোদাই করা উদ্ভাস দর্শককে প্রীত করে তাও বুঝি আমাদের গদ্যে অনুপস্থিত। পুঁজি বাড়ানোর কাজে সামন্ততন্ত্রের বাসিন্দাদের আগ্রহ স্বাভাবতঃই কম। বোধ

হয় একই কারণে গদ্যে লেখকদের রচনারীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা কম। আবার তুলনা করলে দেখা যাবে প্রবীনদের তুলনায় নবীনরা নিজস্ব রচনারীতি গড়ে ভোলার কাজে অধিকতর যত্নবান ; পুরান গণ্ডিতে নবীনদের তুলনায় প্রবীনরা অধিকতর স্বস্তি বোধ করবেন, এটা স্বাভাবিক বৈকি।

সামন্ততন্ত্রের একটি বড় গুণ মানুষকে তা বংশ-গৌরব ও সম্ভ্রম-বোধে আস্থাবান করে। কিন্তু সে অতীতপ্রীতি উপাখ্যান ও চিত্রধর্মী, বিশ্লেষণমূলক বা মূল্যায়নাভিলাসী নয়। আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যানুন্ধানে, পুঁথির গবেষণা, লোকসাহিত্য-প্রীতি সকল ক্ষেত্রে অতীতের রোমন্থন ও গৌরবের কাহিনীতে আত্ম-সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা যত দেখা যায় অতীতের বর্তমানকে কর্মে ও চিন্তায় নতুন করে প্রতিফলিত করার নিষ্ঠা ততটা চোখে পড়ে না। জসীম উদ্দীনের একটি কবিতায় নগর-প্রবাসী বালক গ্রামে ফিরে লতা-পাতার আবডাল সরিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে খুঁজে পাবার যে সঙ্কল্পের কথা বলেছে আমাদের অতীত-প্রীতি তারই সমধর্মী ; অতীতকে কখনো কখনো আমরা দেখতে যাই কিন্তু বর্তমানের চিন্তায় তার মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার কাজে উৎসাহ দেখাতে পারি না। অতীতের কাহিনী বর্ণনায় আমাদের গদ্য যতটা সমৃদ্ধ, তার চরিত্র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টায় ততটা নয়। তাই একদিকে লেখকদের সাল তারিখ জন্মস্থান নিয়ে অমন বিতণ্ডা, এবং অন্যদিকে তাঁদের সাহিত্য কর্মের মূল্যনিরূপণে অনীহা আমাদের সাহিত্য সমালোচনার দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রা স্বভাবতঃই সরল ; সেখানে বৈচিত্র্য অল্প, সঙ্কীর্ণতা বেশী। আমাদের গদ্য রচনায় এই সারল্যের প্রতিভাস ভুল করবার মত নয়। সংশয়হীন সরল বিশ্বাস ও উচ্ছসিত অতিকথনই একাধারে সারল্যের নিদর্শন ও প্রমান, দুইই। উচ্ছাস এবং ভাবালুতার প্রাচুর্যও দুর্নিরীক্ষ নয়। অকারনে উত্তেজিত ও অহেতুক কান্না-ভারাক্রান্ত হওয়াকে আর যাই হোক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলতে পারি না। বলা বাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যে উত্তেজিত উচ্ছ্বাস বা আর্দ্র ভাবালুতা এদের কোনটারই অভাব নেই। আছে সহনশীলতার অভাব। হয় অতি প্রশংসা না হয় অতি নিন্দা, অতি সরলীকরণ, উঁচুগলায় কথা এবং সর্বোপরি তুলনামূলক বিচার-পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ ঐ ক্ষীণ স্বাস্থ্যের বিশ্বস্ত অনুচর। আমাদের গদ্যের ধীরমন্থন শিথিলস্বভাব গতিতে প্রাণৈশ্বর্য্যের

মন্থরতা সামন্ত-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বৈ কি! আর ঐ গদ্য নিয়ে যে আমরা সন্তুষ্ট-চিত্ত তাও সামন্ত-সংস্কৃতি শোভন। সন্তুষ্ট-চিত্ত বলেই হয়ত তুলনামূলক সমালোচনায় আমরা অতটা অনুৎসাহী।

কিন্তু এ-সংস্কৃতিও পাল্টাচ্ছে। এর এক অংশ ক্রমশঃ নাগরিক হয়ে উঠছে। এবং এই পরিবর্তনের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই গদ্য রচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে রম্য-রচনা ও ভ্রমণকাহিনীতে এর প্রতিভাস লক্ষণীয়। সেখানে গদ্যরীতি চঞ্চল, কোথাও কোথাও চটুল, হয়ত বা খানিকটা উৎকেন্দ্রিকও। কিন্তু সেটা বহিরঙ্গের ব্যাপার। নগরস্বভাব এখনো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি; তাই গদ্যরীতি বিধৃত জীবনদৃষ্টি এখনো অতি উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন। বিশেষ করে ভ্রমণকাহিনী-র অনেক জায়গাতেই যে বিস্ময়বোধের বিহ্বল প্রকাশ রয়েছে তা গ্রাম্যতারই নামান্তর।

আমাদের গদ্যে যে ক্ষিপ্রতার অভাব তার একটি কারণ বাংলা গদ্যকে এখনো আমরা নিত্যব্যবহার্য্য করে তুলতে পারিনি। গদ্যও একটি ব্যবহারিক শিল্প এবং এর উৎকর্ষ ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজীর চলই বেশী, বাংলা এখনো শিক্ষার মাধ্যম নয়। একদিক দিয়ে অবস্থাটা ষোড়াশ-সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মত। সেকালে বেকনের মত লেখকও তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী ইংরেজীতে না লিখে লাটিনে লিখেছেন, নিউটন তাঁর তত্ত্বের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর চাইতে লাটিনকে অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করেছেন। ইংল্যাণ্ডে একদিন লাটিন যে-মর্য্যাদা পেয়েছে, ইংরেজী আমাদের কাছে সে-মর্য্যাদাই দাবী করে। এবং এ পরিস্থিতি গদ্যের উৎকর্ষবৃদ্ধির সহায়ক যদি না হয় তা হলে তাতে আশ্চর্য্য হওয়া আযৌক্তিক। অন্যদিকে আবার এও স্মরণীয় যে মুসলিম শাসক ও খৃষ্টানমিশনারীরা জন-জীবনের কাছাকাছি আসবার প্রয়োজনীয়তা অমন করে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বাংলা গদ্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ নিয়মটা অর্থনীতি বর্ণপরিচয়ের: চাহিদা

থাকলে সরবরাহ বাড়বেই। গদ্যের উৎকর্ষ চাইলে তবেই তার উৎকর্ষ সম্ভব হবে। আর চাওয়া মানে যে মূল্যদানের ক্ষমতা এ কথাও ত ঐ বর্ণপরিচয়েরই কথা। ব্যবহারিক জীবনে বাংলা গদ্যের প্রয়োগ ও প্রচলন যত বাড়বে গদ্য-রীতির ক্ষিপ্রতাও যে তত বাড়বে, এটা খুবই সাধারণ সত্য।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী প্রকৃতি নির্ধারক আরো কয়েকটি সত্যের মুখোমুখি হওয়াও আমাদের প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের সাহিত্যিক রুচির কথাটি বিবেচনা করা যাক। গদ্যরচনার সঙ্গে রুচির যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি। এবং সকলেই জানেন আমাদের সাহিত্যিক রুচি নিতান্তই গ্রাম্যস্বভাব, সে এখনো পরিশীলিত নাতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের একজন প্রতিষ্ঠিতযশ সমালোচক একটি বইয়ের সাহিত্যিকগুণের প্রশংসা করেছেন এই ভেবে যে ঐ বইটি জনশিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করবে। অপর একজন প্রবীন সাহিত্যসেবী নিজেকে মুরগী ও নিজের সাহিত্যকর্মকে মুরগীর ডিম পাড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর একজন গল্প লেখক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কোন কোন আপিসে চাকরি করেছেন, কি করে অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, কোন কারণে আই, এ, ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারেননি সদম্ভে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য এগুলি উদাহরণ মাত্র, রুচির এ ধরণের প্রকাশের সঙ্গে পাঠকমাত্রেরই কমবেশী পরিচয় আছে। নিষ্করুণ সত্যটি এই যে আমাদের গদ্য ঐ অপরিশীলিত রুচিরই ফলশ্রুতি। সাম্প্রতিক কালে লোকসাহিত্যে আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যকে যদি আমাদের ভদ্রসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি তাহলে সে নিশ্চয়ই সুখের কথা হবে, কিন্তু তার অমার্জ্জিত পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাতে উৎফুল্ল হওয়া বোধ হয় সমীচীন নয়। গ্রাম্যতা বর্জনটাই আমাদের সমস্যা, অর্জন নয়। সেই সঙ্গে একথাও বোধ করি স্মরণ করা উচিৎ যে আমাদের দেশে সাহিত্যচর্চা মানসিক বিলাস বৈ নয়। আর পাঁচটি প্রয়োজনীয় কাজের ভিড়ে তার আবস্থান সসঙ্কোচ। রচনায় যদি নিষ্ঠার

অভাব প্রতিফলিত দেখা যায় তাহলে অনুমান করা সম্ভব এর একটি কারণ এই যে সাহিত্যচর্চা লেখকের অর্থনৈতিক জীবনের অঙ্গে পরিণত হয় নি। সকলেই জানেন, দেশে প্রচুর সংখ্যক প্রকাশক নেই, বিশেষ করে প্রবন্ধ সঙ্কলনের প্রকাশকের সংখ্যাত' নিতান্তই নগণ্য। তাই এমন কি সাহিত্য-সমালোচনার বইতেও 'পূর্বপাকিস্তানের যাবতীয় উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য লিখিত' এই বিজ্ঞপ্তি কৌতুকের সৃষ্টি করে না, করুণ রসেরই বরং সঞ্চার করে। এও লক্ষণীয় যে বেশীর ভাগ গদ্য লেখকের পেশা শিক্ষকতা ; তাঁদের রচনাতেও পেশাগত বৈশিষ্ট্যের প্রক্ষেপ ঘটেছে। রচনারীতি ও বক্তব্য উভয়ই দিক দিয়েই তাঁদের গদ্য academic.

গদ্য লেখককে যে প্রকাশ মাধ্যম নিয়ে কাজ করতে হয় তার ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা কবিতার বয়স হাজার বছরেরও বেশী, তার পাশে গদ্যের বয়স দুশ বছরও পার হয় নি। প্রাচীন কবিতা তাই নবীন গদ্যকে আচ্ছন্ন করতে অক্ষম হয় নি। কবিতার বয়স গদ্যের বয়সের চাইতে বেশী হওয়াটা অবশ্য অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সেটাই বরং নিয়ম; কিন্তু দু'য়ের মধ্যে বয়সের এ-পার্থক্য যে বাংলা গদ্যের অনেক দুর্বলতার জন্য দায়ী তাও সত্য। বয়স দিয়ে অবশ্য মনের বিকাশ ঠাহর করা যায় না। উর্দু গদ্য ও বাংলা গদ্য প্রায় সমবয়সী। কিন্তু এদের মানসিক বিকাশে বিভিন্নতা আছে। ডঃ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্, সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'বাঙলা গদ্যের গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্যাস-নাটক ও রম্য রচনার প্রাচুর্য্যে, ভাবসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে, আর উর্দু স্বকীয়তা অর্জন করেছে তার তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক ও তত্ত্বহুল রচনার সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে।' তাঁর মতে এর কারণ উর্দুগদ্য ফার্সি সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছে এবং 'বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গী ও রচনারীতির classical tradition উর্দুকে যেমন প্রাণশক্তি ও ঐশ্বর্য্য দিয়েছে বাংলার ক্ষেত্রে তেমন হয় নি।' Classical tradition এর সঙ্গে সংযোগের অভাব বাংলা গদ্যের দুর্বলতার একটি কারণ

সন্দেহ নেই। তদুপরি এক ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। এই কারণগুলির সম্মিলিত ফল প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে গদ্যকে দুর্বল করেছে সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য দুর্বল বা অপরিপুষ্ট একথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা অর্থহীন। কেননা আসল সত্যটি হল এই যে, গদ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার চেহারাটাই ধরা পড়েছে। দর্পণে যে ছবি পড়েছে তা যদি প্রীতিপ্রদ না হয় তা হলে তার জন্য দর্পনকে দোষ দেওয়া উচিৎ নয়। আমরা যা আমাদের গদ্যে তার চেহারাই প্রতিফলিত হয়েছে। এ সত্যটি আমাদের মেনে নিতে হবে। এবং গদ্যের উৎকর্ষ-চিন্তায় যদি আমরা চিন্তিত হই তা হলে কি পন্থায় সে উৎকর্ষ সাধন সম্ভব এ প্রশ্নের জবাবও সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংযোগ গ্রন্থিতেই খুঁজতে হবে। আমরা বদলালে আমাদের গদ্যও বদলাবে।